Swami Vivekananda Advanced Journal for Research and Studies
Online Copy of Document Available on: www.svajrs.com

ISSN:2584-105X Pg. 38-46

মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যে আদিবাসী জীবনের বাস্তবতা ও প্রতিরোধের নান্দনিক রূপায়ণ: অরন্যের অধিকার ও নির্বাচিত ছোটগল্পের প্রেক্ষিতে

Md Reajul islam
Former Student, Dept. of Bengali,West Bengal State University
West Bengal, India
Email I'd- mdreajulislm@gmail.com

Accepted: 02/04/2026
Published: 03/04/2026 *DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.19400751*

Abstract

" আমি কোনোদিন কল্পনা থেকে লিখিনি। আমার লেখার উপকরণ হলো জীবন,

ইতিহাস এবং মানুষের লড়াই। আদিবাসীরা আমাদের দেশের প্রকৃত মালিক,

অথচ তারাই আজ সবচাইতে ব্রাত্য।"

(মহাশ্বেতা দেবীর সাক্ষাৎকার,'বর্তমান' পত্রিকা)

জ্ঞানপীঠজয়ী সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী বাংলা সাহিত্যের এক অমর কণ্ঠস্বর। যিনি আদিবাসী ও প্রান্তিক মানুষের জীবন রেখাকে তাঁর লেখায় অমর করে রেখেছেন । বিংশ শতাব্দীর বাংলা কথাসাহিত্যের মানচিত্রে মহাশ্বেতা দেবী এক অনন্য ও স্পর্ধিত ব্যতিক্রম। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি কেবল নন্দনতাত্ত্বিক বিলাসিতা নয়, বরং তা এক নিরবচ্ছিন্ন আর্থ-সামাজিক ও ঐতিহাসিক দস্তাবেজ । বিশেষত, ভারতবর্ষের আদিবাসী জনজীবনের প্রান্তিকতা, অস্তিত্বের সংকট এবং নিগূঢ় বঞ্চনাকে তিনি যে নিরাসক্ত অথচ সংবেদনশীল দৃষ্টিতে রূপায়ণ করেছেন, তা বিশ্বসাহিত্যে বিরল। মহাশ্বেতা দেবীর আখ্যানভাগ কেবল অরণ্যচারী মানুষের দৈনন্দিন জীবনবৃত্তান্ত নয়, বরং তা ঔপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে এক শাণিত নান্দনিক প্রতিবাদ । এই রিসার্চ আর্টিকেলে তাঁর উপন্যাস 'অরণ্যের অধিকার' এবং নির্বাচিত ছোটগল্প যেমন 'দ্রৌপদী', 'রুদালি', 'স্তনদায়িনী' শিকার ,প্রভৃতির প্রেক্ষিতে আদিবাসী জীবনের কঠোর বাস্তবতা এবং তাদের প্রতিরোধের নান্দনিক রূপায়ণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মহাশ্বেতা দেবী শুধু শোষণের চিত্র তুলে ধরেননি, বরং আদিবাসীদের সঙ্গে অরণ্যের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, তাদের দারিদ্র্য, নির্যাতন এবং বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে এক শক্তিশালী নান্দনিক ভাষা তৈরি করেছেন। এই লেখায় দেখা যাবে কীভাবে তিনি ইতিহাস, লোককথা ও বাস্তব অভিজ্ঞতাকে মিলিয়ে এক অনন্য সাহিত্যিক রূপ দিয়েছেন, যা পাঠককে প্রতিরোধের চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ করে।

***Keywords**: মহাশ্বেতা দেবী, আদিবাসী জীবন, অরণ্যের অধিকার, দ্রৌপদী, রুদালি, স্তনদায়িনী, শিকার , নান্দনিক রূপায়ণ, শোষণ, উলগুলান।*

ভূমিকা

মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬) বাংলা সাহিত্যের এক অসামান্য লেখিকা, যিনি শুধু সাহিত্যিক নন, একজন সক্রিয় সমাজকর্মী ও মানবাধিকারকর্মীও বটে। তাঁর লেখায় আদিবাসী জনজীবনের কথা বারবার উঠে এসেছে। তিনি বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ছত্তিশগড়সহ বিভিন্ন জায়গায় আদিবাসীদের সঙ্গে

ঘনিষ্ঠভাবে মিশে ,তাদের দুঃখ-কষ্ট নিজ দৃষ্টি ও গভীর মন দিয়ে অনুভব করেছেন এবং লিখেছেন। তাঁর মতে, "আমার লেখাগুলো আসলে তাদেরই হাতে লেখা।" এই ভাবনা থেকেই তাঁর সাহিত্যে আদিবাসীদের বাস্তব জীবন ও তাদের প্রতিরোধের গল্প ফুটে উঠেছে।

'অরণ্যের অধিকার' (১৯৭৭) উপন্যাসটি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কর্ম। এই উপন্যাসে ১৯শ শতাব্দীর শেষভাগের মুন্ডা বিদ্রোহ বা 'উলগুলান'-এর কাহিনি বর্ণিত হয়েছে, যার নেতৃত্বে ছিলেন বীরসা মুন্ডা। উপন্যাসটি শুরু হয় জেলখানায় বীরসার মৃত্যুর দৃশ্য দিয়ে, তারপর স্মৃতিরণে ফিরে যায় তার শৈশব ও সংগ্রামে। অরণ্য এখানে শুধু প্রকৃতি নয়, আদিবাসীদের জীবন, আহার, আবাস ও সংস্কৃতির প্রতীক। দিকু অর্থ্যাৎ যারা বাইরের শোষক তাদের দখলের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের প্রতিরোধ এখানে মূল বিষয়।

অন্যদিকে তাঁর ছোটগল্পগুলোতে আদিবাসী নারীর জীবন আরও তীব্রভাবে উঠে এসেছে। 'দ্রৌপদী' গল্পে সাঁওতাল নারী দোপদি মেঝেন পুলিশের নির্যাতনের শিকার হয়েও প্রতিরোধ করে। 'রুদালি'তে শনিচরী নিজের দুঃখকে অশ্রু দিয়ে নয়, বরং অন্যের মৃত্যুতে কান্না করে জীবিকা নির্বাহ করে। 'স্তনদায়িনী'তে যশোদা তার স্তনকে পণ্য করে পরিবারকে বাঁচায়। এই গল্পগুলোতে শোষণের বাস্তবতা যেমন কঠোর, তেমনি প্রতিরোধের নান্দনিকতাও অসাধারণ।

এই আর্টিকেলে আমরা দেখব কীভাবে মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসী জীবনের বাস্তবতাকে সাহিত্যের ভাষায় রূপ দিয়েছেন এবং প্রতিরোধকে এক নান্দনিক মাত্রা দিয়েছেন। তাঁর লেখায় ইতিহাস, মিথ, লোককথা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা মিলেমিশে এক অনন্য শিল্প সৃষ্টি হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা :

মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্য নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। অনেক সমালোচক তাঁকে 'অরণ্যজননী' বলে অভিহিত করেছেন কারণ তিনি অরণ্য ও আদিবাসীদের জীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছেন। 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসটি ঐতিহাসিক উপন্যাস হলেও এতে রাজনৈতিক ও সামাজিক মাত্রা রয়েছে। বীরসা মুন্ডাকে তিনি শুধু বিদ্রোহী নয়, অবতার ও কিংবদন্তির রূপে দেখিয়েছেন। অরণ্য উচ্ছেদ মানে আদিবাসীদের জীবন বিপন্ন- এই বার্তা উপন্যাস জুড়ে ছড়িয়ে আছে।

ছোটগল্প নিয়ে সমালোচনায় 'দ্রৌপদী'কে অনেকে নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষিতে দেখেন। দোপদি মেঝেন মহাভারতের দ্রৌপদীর মতো অপমানিত হয়, কিন্তু সে প্রতিরোধ করে নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে। এখানে নারী শরীর প্রতিরোধের অস্ত্র হয়ে ওঠে। 'রুদালি' গল্পে আদিবাসী নারীর দারিদ্র্য ও শ্রমের চিত্র ফুটে উঠেছে। শনিচরী রুদালি হয়ে অন্যের দুঃখে কাঁদে, কিন্তু নিজের দুঃখে নয়। 'স্তনদায়িনী'তে মাতৃত্বকে পণ্য করে তোলা হয়েছে, যা শোষণের চরম রূপ।

'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে আদিবাসী জীবন ও প্রতিরোধ

মহাশ্বেতা দেবী বাংলা সাহিত্যের এক অসামান্য কণ্ঠস্বর, যিনি প্রান্তিক, নিম্নবর্গীয় ও আদিবাসী মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর লেখায় ইতিহাস, রাজনীতি ও মানবিকতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত । আদিবাসীদের শোষণ, বঞ্চনা ও প্রতিরোধের কাহিনি তাঁর সাহিত্যের মূল সুর। এর মধ্যে 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মহাশ্বেতা দেবী নিজস্ব জবানবন্দিতে 'ভূমিকা' অংশে লিখেছেন-

"বিরসা মুন্ডা ও তাঁর অনুগামীদের লড়াই ছিল জল-জঙ্গল-জমিনের অধিকার

রক্ষার লড়াই। আমি চেয়েছি ইতিহাসের সেই ধুলোমলিন পাতা থেকে সত্যকে

তুলে আনতে।" (অরণ্যের অধিকার, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা)

'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে মহাশ্বেতা দেবী মুন্ডা আদিবাসীদের জীবনকে অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবে চিত্রিত করেছেন।অরণ্য তাদের জীবনের অংশ— খাদ্য, আশ্রয়, সংস্কৃতি সবকিছুই। ব্রিটিশ শাসন ও জমিদারদের দখলের ফলে অরণ্য হারিয়ে তারা ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের শিকার হয়। উপন্যাসের শুরুতে বীরসার জেলে মৃত্যুর দৃশ্য দেখে স্ব-হৃদয় পাঠক অনুভব করতে পারে শোষণের কঠোরতা।

" ৯ ই জুন ১৯০০। রাচি জেল।

সকাল আটটার সময়ে বিরসা রক্তবমি করে অজ্ঞান হয়ে যায়।....

মুন্ডার জীবনে ভাত একটা স্বপ্ন হয়ে থাকে। ঘাটো একমাত্র খাদ্য যা মুন্ডারা খেতে পায়।

.....বিরসা মারা গেল সকাল ন-টায়। "

বীরসা মুন্ডা চরিত্রটি অসাধারণ। সে মিশনারি স্কুলে পড়েও আদিবাসী সংস্কৃতিতে ফিরে আসে। সে 'উলগুলান' বা মহাবিদ্রোহের নেতা হয়ে ওঠে। উপন্যাসে দেখানো হয়েছে কীভাবে দিকুরা অরণ্য কেটে রেললাইন, জাহাজ তৈরি করে, আদিবাসীদের জমি দখল করে। বীরসা মুন্ডা অরণ্যের অধিকার ফিরিয়ে আনতে চায়। সমালোচক উজ্জ্বলকুমার মজুমদার মন্তব্য করেছেন –

" মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার' ইতিহাসকে শুধু কালানুক্রমিক ঘটনা

হিসেবে দেখেনি, বরং আদিবাসী মুন্ডা সমাজের ভেতরকার যন্ত্রণা ও প্রতিরোধের

এক মহাকাব্যিক রূপ দান করেছে।"

উপন্যাসটি শুধু ঐতিহাসিক ঘটনার পুনর্নির্মাণ নয়, বরং আদিবাসী জীবনের কঠোর বাস্তবতা, অরণ্যের সঙ্গে তাদের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক এবং প্রতিরোধের নান্দনিক রূপায়ণের এক অনন্য দলিল। সমালোচক শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন –

" মহাশ্বেতা দেবীর কলমে আদিবাসী জীবন কোনো রোমান্টিক অরণ্য-বিলাস নয়,

তা এক চরম রূঢ় বাস্তব এবং সেই বাস্তবের বুক চিরে বেরিয়ে আসা বিদ্রোহের

আগুন।"

'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসের কাহিনি শুরু হয় রাঁচি জেলখানায় বীরসা মুন্ডার মৃত্যুর দৃশ্য দিয়ে। ১৯০০ সালের ৯ জুলাই, মাত্র ২৫ বছর বয়সে ব্রিটিশ নির্যাতনে ধুকতে ধুকতে তাঁর মৃত্যু হয়। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে লেখা হয় 'কলেরা'। কিন্তু মহাশ্বেতা দেবী স্মৃতিচারনের মাধ্যমে পাঠককে নিয়ে যান বীরসার শৈশব, যৌবন ও বিদ্রোহের দিনগুলোয়। উপন্যাসটি বীরসার জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও এটি একক চরিত্রের কাহিনি নয়; এটি সমগ্র মুন্ডা সম্প্রদায়ের সংগ্রামের প্রতীক।

বীরসা জন্মগ্রহণ করেন ছোটোনাগপুরের অরণ্যাঞ্চলে। শৈশবে তিনি গরু চরান, ঘাটো খেয়ে বেঁচে থাকেন। ভাত তাঁদের কাছে স্বপ্নের খাবার। দিকু অর্থ্যাৎ বহিরাগত, জমিদার, ব্যবসায়ী, মিশনারিদের অত্যাচারে মুন্ডাদের জমি-জমা কেড়ে নেওয়া হয়, অরণ্য উচ্ছেদ করা হয়। বীরসা মুন্ডা মিশনে শিক্ষা গ্রহণ করেন, কিন্তু সেখানকার ধর্মীয় শোষণ ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন তাঁকে বিদ্রোহী করে তোলে। তিনি নিজেকে 'ধরতি-আবা' তথা ভগবান বলে ঘোষণা করেন এবং 'উলগুলান'-এর ডাক দেন। মুন্ডারা তীর-ধনুক-বল্লম নিয়ে ব্রিটিশ ও দিকুদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। বিদ্রোহ দমন করা হয় নির্মমভাবে, কিন্তু 'উলগুলানের মরণ নাই'— এই বাণী উপন্যাসের শেষে প্রতিধ্বনিত হয়।

মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যে আদিবাসী জীবন কখনো রোমান্টিক বা আদর্শায়িত নয়। 'অরণ্যের অধিকার'-এ তিনি নির্মম বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন। মুন্ডাদের জীবন অরণ্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। অরণ্য তাদের জননী, আহার, আবাস ও সংস্কৃতির উৎস। কিন্তু ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতি, জমিদারি প্রথা ও মিশনারিদের আগ্রাসনে এই অরণ্য ক্রমশ লুণ্ঠিত হয়। উপন্যাসে দেখা যায়, মুন্ডারা 'ঘাটো' খেয়ে বেঁচে থাকে। ভাত তাদের কাছে দূরের স্বপ্নমাত্র। বীরসার জীবনে ভাত একটি প্রতীকী উপাদান—যা শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভকে জাগিয়ে তোলে। -

"মুন্ডা শুধা ঘাটো খাবে কেন? কেন সে দিকুদের মত ভাত খাবে না?"

এই প্রশ্ন বীরসার বিদ্রোহের মূলে। অরণ্য উচ্ছেদের ফলে তাদের জীবিকা নষ্ট হয়, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধ্বংস হয়। মিশনারিরা খ্রিস্টধর্ম প্রচারের নামে তাদের সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে, জমিদাররা জমি দখল করে। সাহিত্য সমালোচক ড.সুমিতা চক্রবর্তী যা বলেছেন তা স্মরণযোগ্য -

" বিরসা মুন্ডা এই উপন্যাসে কেবল এক ঐতিহাসিক চরিত্র নন, তিনি অরণ্যের

মানুষের বেঁচে থাকার অধিকারের এক চিরন্তন প্রতীক। মহাশ্বেতা দেবী এখানে মিথ

ও বাস্তবকে এক সুতোয় বেঁধেছেন।"

মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট বিবরণ দিয়ে বাস্তবতা ফুটিয়ে তুলেছেন -তাদের লোকাচার, গান, নাচ, বিশ্বাস ও কুসংস্কার। তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে ঔপনিবেশিক শাসন ও পুঁজিবাদী শোষণ তাদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে। এখানে অরণ্য শুধু প্রকৃতি নয়, এটি তাদের অধিকারের প্রতীক। অরণ্য হারানো মানে জীবন হারানো। এই বাস্তবতা মহাশ্বেতার অন্যান্য রচনা যেমন 'চোট্টি মুন্ডা এবং তার তীর', 'রুদালি' বা 'দ্রৌপদী'-তেও দেখা যায়, কিন্তু 'অরণ্যের অধিকার'-এ এটি ইতিহাসের সঙ্গে মিশে আরও গভীর মাত্রা পায়। একইসঙ্গে তিনি আদিবাসী সমাজের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বও এড়িয়ে যাননি। ধর্মীয় কুসংস্কার, নারী-পুরুষের অসমতা—সবকিছুই তাঁর

লেখায় স্থান পেয়েছে। কিন্তু শোষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধই মূল সুর।

প্রতিরোধের নান্দনিক রূপায়ণ

মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো প্রতিরোধের নান্দনিক রূপায়ণ। 'অরণ্যের অধিকার'-এ প্রতিরোধ শুধু রাজনৈতিক নয়, এটি সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক ও পরিবেশগত। বীরসা মুন্ডা একজন সাধারণ রাখাল থেকে বিপ্লবী, তারপর 'ভগবান'-এ রূপান্তরিত হন। এই রূপান্তরের মাধ্যমে মহাশ্বেতা দেবী লোককথা, মিথ ও ইতিহাসকে মিশিয়ে এক নতুন নান্দনিকতা সৃষ্টি করেছেন।

বীরসার বিদ্রোহ 'উলগুলান'—যা 'মহাবিদ্রোহ' অর্থে ব্যবহৃত। এটি শুধু অস্ত্রের লড়াই নয়, অরণ্যের অধিকার ফিরিয়ে আনার লড়াই।বীরসা বলেন, "অরণ্যের অধিকার এই অন্ধকার দেশের প্রথম অধিকার।" এখানে অরণ্যকে 'জননী' রূপে দেখানো হয়েছে—যা শোষিত হয়েছে, অশুচি হয়েছে। বীরসা এই 'অরণ্যজননী'র সম্মান রক্ষার জন্য লড়াই করেন। এই প্রতীকী ব্যবহার নান্দনিকতার এক উচ্চ মাত্রা যোগ করে।

মহাশ্বেতা দেবীর ভাষা সরল, কিন্তু তীক্ষ্ণ। তিনি আদিবাসীদের মুখের ভাষা, লোকগাথা ও স্থানীয় শব্দ ব্যবহার করে এক অনন্য শৈলী গড়ে তুলেছেন। ফ্ল্যাশব্যাক কৌশল, বহুকণ্ঠী বর্ণনা ও বাস্তব ঘটনার সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণ তাঁর নান্দনিকতার বৈশিষ্ট্য। উপন্যাসে বীরসার মৃত্যু দিয়ে শুরু করে পিছনের কাহিনি বলার কাঠামো পাঠককে সরাসরি প্রতিরোধের মধ্যে নিয়ে যায়। আর শেষে –

" কিছুই ফুরোয় না পৃথিবীতে – মুন্ডারী দেশ - মাটি -পাথর-পাহাড়-বন-নদী-ঋতুর পর ঋতুর

আগমন - সংগ্রামও ফুরোয় না , শেষ হতে পারে না । পরাজয়ে সংগ্রাম শেষ হয় না । থেকে যায় ,

কেননা মানুষ থাকে , আমরা থাকি । "

এই বাক্য প্রতিরোধকে অমর করে তোলে। প্রতিরোধ এখানে ব্যক্তিগত থেকে সমষ্টিগত হয়ে ওঠে। বীরসা একা নন; তাঁর সঙ্গে রয়েছে সমগ্র মুন্ডা সম্প্রদায়।নারীদের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। এই সমষ্টিগত প্রতিরোধ মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যে নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনার এক নান্দনিক রূপ।

'অরণ্যের অধিকার' একটি ইকো-ক্রিটিক্যাল উপন্যাসও বটে। অরণ্যকে কেন্দ্র করে পরিবেশগত সচেতনতা ফুটে ওঠে। আদিবাসীরা অরণ্যকে শোষণ করে না, বরং তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন যাপন করে। কিন্তু ঔপনিবেশিকতা ও পুঁজিবাদ এই ভারসাম্য নষ্ট করে।বীরসার বিদ্রোহ পরিবেশগত ন্যায়বিচারেরও প্রতীক। আজকের দিনে জঙ্গলমহল, নকশাল আন্দোলন বা আদিবাসী অধিকার আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এই উপন্যাস অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক । রাজনৈতিকভাবে এটি ঔপনিবেশিকতা, সামন্ততন্ত্র ও ধর্মীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ । মহাশ্বেতা দেবী নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটেও আদিবাসী সংগ্রামকে দেখেছেন। তাঁর লেখা শুধু অতীতের ইতিহাস নয়, বরং বর্তমানের প্রতিরোধের অনুপ্রেরণা। মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যে আদিবাসী জীবনের বাস্তবতা ও প্রতিরোধের নান্দনিক রূপায়ণ 'অরণ্যের অধিকার'-এ চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে। তিনি ইতিহাসকে কল্পনার সঙ্গে মিশিয়ে এক নতুন সাহিত্যরূপ সৃষ্টি করেছেন। এটি শুধু উপন্যাস নয়, একটি দলিল - যা আদিবাসীদের অধিকারের কথা বলে।

আজকের বিশ্বে যখন পরিবেশ সংকট, আদিবাসী উচ্ছেদ ও সাংস্কৃতিক লুণ্ঠন চলছে, তখন 'অরণ্যের অধিকার' আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়—প্রতিরোধ অমর। -" উলগুলানের শেষ নেই। ভগবানের মরণ নাই।" মহাশ্বেতা দেবী শুধু লেখিকা নন, তিনি আদিবাসীদের 'অরণ্যজননী'। তাঁর কলমে আদিবাসী জীবনের কান্না, ক্ষোভ ও লড়াই চিরকালীন হয়ে উঠেছে। পরিশেষে সমালোচক ও ইতিহাসবিদ প্রমোদকুমার সেনগুপ্তের মন্তব্য স্মরণযোগ্য –

" ভারতের আদিবাসী বিদ্রোহগুলোর সঠিক মূল্যায়ন সাহিত্যে বিরল ছিল, মহাশ্বেতা

দেবীর 'অরণ্যের অধিকার' সেই অভাব পূরণ করেছে বিরসা মুন্ডার উলগুলান-কে

বিশ্বসাহিত্যের দরবারে প্রতিষ্ঠা করে।"

নির্বাচিত ছোটগল্পে আদিবাসী জীবনের বাস্তবতা ও প্রতিরোধ

মহাশ্বেতা দেবী বাংলা সাহিত্যের অন্যতম লেখিকা , যিনি আদিবাসী ও অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের জীবন, শোষণ, সংগ্রাম এবং প্রতিরোধকে তাঁর লেখায় অসামান্য নান্দনিকতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর সাহিত্য শুধু বাস্তবতার দলিল নয়, বরং প্রান্তিক মানুষের অস্তিত্বের লড়াইয়ের একটি রাজনৈতিক ও নান্দনিক প্রকাশ । এর মধ্যে **'দ্রৌপদী'** অনন্য উদাহরণ। এই গল্পে সাঁওতাল আদিবাসী নারী দোপদী মেঝেন তথা দ্রৌপদী

চরিত্রের মাধ্যমে আদিবাসী জীবনের কঠোর বাস্তবতা, রাষ্ট্রীয়-সামন্ততান্ত্রিক শোষণ এবং নারীর শরীরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা প্রতিরোধের এক অসাধারণ নান্দনিক রূপায়ণ ঘটিয়েছেনে।

গল্পের পটভূমি নকশাল আন্দোলনের (১৯৬৭-৭১) সময়কালীন পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ ও জঙ্গল অঞ্চল। দোপদী একজন সাঁওতাল আদিবাসী নারী, যিনি তাঁর স্বামী দুলাল মাঝির সঙ্গে অত্যাচারী জমিদার সূর্য সাহুর হত্যায় জড়িত ছিলেন। পরে স্বামী নিহত হলে দোপদী উপী মেঝেন ছদ্মনামে আত্মগোপন করেন এবং বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। সেনানায়ক যিনি আদিবাসীদের দমনের দায়িত্বে তাঁকে ধরিয়ে দিতে চান। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে দোপদীকে পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেনানায়কের নির্দেশে তাঁকে গণধর্ষণ করা হয়।

কিন্তু গল্পের চরম মুহূর্তে যখন দোপদী নগ্ন, রক্তাক্ত শরীর নিয়ে সেনানায়কের সামনে দাঁড়িয়ে নির্ভিক কন্ঠে বলেন -

“তুমি আমাকে খুলে ফেলতে পারো, কিন্তু আবার কীভাবে পোশাক পরাবে?

কাউন্টার মি - কাম অন, কাউন্টার মি?”

এই দৃশ্যটি গল্পের ক্লাইম্যাক্স এবং মূল নান্দনিক শক্তি। মহাশ্বেতা দেবী নিজে আদিবাসীদের সঙ্গে দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন এবং তাঁদের জীবনযাপন, ভাষা, সংস্কৃতি ও শোষণের সাক্ষী ছিলেন। ‘দ্রৌপদী’-তে এই বাস্তবতা অত্যন্ত কাঁচা ও নির্মমভাবে ফুটে উঠেছে। মহাশ্বেতা দেবীর 'দ্রৌপদী' কেবল একটি গল্প নয়, এটি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস এবং লিঙ্গীয় রাজনীতির বিরুদ্ধে আদিবাসী শরীরের এক চরম নান্দনিক ও রাজনৈতিক প্রতিবাদ।

প্রতিরোধের নান্দনিক রূপায়ণ -

‘দ্রৌপদী’ গল্পের সবচেয়ে শক্তিশালী দিক হলো প্রতিরোধের নান্দনিকতা। মহাশ্বেতা দেবী এখানে শরীরকে প্রতিরোধের প্রধান স্থান করে তোলেন। মহাভারতের দ্রৌপদীর সঙ্গে তুলনা করে বিপরীত পন্থা অবলম্বন করে। মহাভারতের দ্রৌপদীকে দুঃশাসন বস্ত্রহরণ করতে চায়, কিন্তু কৃষ্ণের কৃপায় বস্ত্র অফুরন্ত হয়। মহাশ্বেতার দোপদীকে কেউ রক্ষা করে না। তিনি নগ্ন থেকেই প্রতিরোধ করেন। এই বিপরীত ভাবনা নান্দনিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী। সমালোচক সুজিত মুখোপাধ্যায় বলেছেন -

“মহাভারতের দ্রৌপদীকে লজ্জা থেকে বাঁচাতে ভগবান এসেছিলেন, কিন্তু মহাশ্বেতার

দ্রৌপদী নিজের সম্মান নিজেই রক্ষা করে তার নগ্নতাকে শোষকের আয়না

হিসেবে তুলে ধরে।”

দ্রৌপদী এমন এক নারীর গল্প, যে চরম লাঞ্ছনার মুখে দাঁড়িয়ে নিজের শরীরকেই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে এবং তার অপমানের চিহ্নকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে পুরাণকে আধুনিক প্রেক্ষিতে পুনর্লিখন করে মহাশ্বেতা দেবী দেখান যে, আদিবাসী নারীর কোনো ঐশ্বরিক রক্ষক নেই; তার প্রতিরোধ স্বয়ংসম্পূর্ণ। ধর্ষণের পর নগ্ন শরীর নিয়ে সেনানায়কের সামনে দাঁড়ানো এটি লজ্জার নয়, বরং ক্ষমতার উল্টো নগ্নীকরণ। সমালোচক সুস্মিতা ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন -

"মহাশ্বেতা দেবীর দ্রোপদী যৌন লাঞ্ছনাকে তার রাজনৈতিক হাতিয়ারে রূপান্তরিত

করেছে। এখানে শরীর আর ভোগের বস্তু নয়, বরং প্রতিবাদের জ্বলন্ত অঙ্গার।"

‘দ্রৌপদী’ শুধু একটি গল্প নয়, এটি আদিবাসী নারীর অস্তিত্বের ঘোষণা। এতে মহাশ্বেতা দেবী দেখিয়েছেন যে, প্রতিরোধ কেবল অস্ত্র দিয়ে নয়, শরীর ও মনের অটুট সাহস দিয়েও হয়। আজকের প্রেক্ষিতে যেখানে আদিবাসী অধিকার, নারী নির্যাতন, রাষ্ট্রীয় দমন এখনও চলমান এই গল্প অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যে আদিবাসী জীবন কখনো করুণার পাত্র নয়, বরং প্রতিরোধের উৎস। ‘দ্রৌপদী’তে এই দর্শনের সবচেয়ে তীব্র ও নান্দনিক প্রকাশ ঘটেছে। যেখানে নগ্নতা হয়ে ওঠে পোশাকের চেয়েও শক্তিশালী, এবং নীরবতা ভেঙে উঠে আসে এক অটুট হাসি। আলোচ্য গল্পটি পড়লে বোঝা যায়, সাহিত্য কেবল আয়না নয়, বরং অস্ত্রও হতে পারে আর মহাশ্বেতা দেবী সেই অস্ত্রটি আদিবাসী নারীর হাতেই তুলে দিয়েছেন। পরিশেষে সমালোচক নবনীতা দেব সেনের ভাষায় বলা যায় -

"মহাশ্বেতা দেবী যখন লেখেন, কলম তখন তরবারি হয়ে ওঠে। দোপদী মেঝেন

সেই কলমের ফলা থেকে জন্ম নেওয়া এক অবিনাশী আগুনের নাম।"

রুদালী - মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যে আদিবাসী ও নিম্নবর্গীয় জীবনের বাস্তবতা ও প্রতিরোধের নান্দনিক রূপায়ন বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর

রচিত 'রুদালী' গল্পে। এটি ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত রাজস্থানের এক গ্রামীণ পটভূমিতে গড়ে ওঠা আখ্যান। যেখানে শোষণ, দারিদ্র্য, লিঙ্গভিত্তিক নিপীড়ন এবং তার বিরুদ্ধে নারীর প্রতিরোধকে নির্মম বাস্তবতার সঙ্গে নান্দনিকভাবে মিশিয়ে তুলে ধরেছেন।

মহাশ্বেতা দেবী নিজে আদিবাসী ও প্রান্তিক সম্প্রদায়ের- সাঁওতাল, লোধা, শবর ইত্যাদি জাতির সঙ্গে দীর্ঘদিন কাটিয়ে তাদের জীবনের সরাসরি অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেছিলেন। 'রুদালী'-তে তিনি সেই বাস্তবতাকে অকপটে ফুটিয়ে তোলেন।প্রধান চরিত্র সানিচারী জন্ম থেকেই 'অশুভ' বলে চিহ্নিত,কারণ সে শনিবার জন্মেছে। তার জীবন দারিদ্র্য, ঋণ, ক্ষুধা ও মৃত্যুর চক্রে আবদ্ধ। স্বামী, শাশুড়ি, দেবর-ভাবীর মৃত্যুর সময়ও সে কাঁদতে পারে না, কারণ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খরচ জোগাতে ঋণ নিতে হয়। ছেলে বুধুয়ার যক্ষ্মায় মৃত্যু, ছেলের বউয়ের চলে যাওয়া, নাতি হারোয়ার পালিয়ে যাওয়া—সবকিছুতেই সে নীরব সহ্য করে।

উচ্চবর্ণের রাজপুত মহাজন ও জমিদারদের শোষণে গ্রামের নিম্নবর্গীয় মানুষেরা চিরকালীন ঋণের জালে আটকে থাকে। মৃত্যুর পরেও তাদের হয়ে কাঁদতে হয়—কেননা রাজপুতরা নিজেরা কাঁদে না। সম্মান রক্ষার জন্য ভাড়া করা 'রুদালী' - পেশাদার ক্রন্দনকারিণির দরকার হয়। এই বাস্তবতা শুধু ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক-অর্থনৈতিক। জাতি, শ্রেণি ও লিঙ্গের ত্রিমাত্রিক শোষণ এখানে স্পষ্ট। নারীর শরীর ও আবেগও পণ্য হয়ে যায়। সানিচারীর জীবন যেন প্রান্তিক আদিবাসী তথা দলিত নারীর প্রতীক—যারা অরণ্য, জমি ও অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে শহর-গ্রামের সীমানায় টিকে থাকার লড়াই করে। সমালোচক পবিত্র সরকার মন্তব্য করেছেন -

"মহাশ্বেতা দেবীর রুদালী আসলে কান্নার রাজনীতির এক অসামান্য ভাষ্য।

যেখানে কান্না কেবল বিলাপ নয়, তা হয়ে ওঠে টিকে থাকার রসদ।"

প্রতিরোধের নান্দনিক রূপায়ন -

'রুদালী' শুধু শোষণের কাহিনি নয়, প্রতিরোধেরও। সানিচারীর রূপান্তর এখানে কেন্দ্রীয়। প্রথমে সে নীরব সহ্যকারিণী। নিজের দুঃখে সে কাঁদতে পারে না, কারণ বেঁচে থাকার লড়াই তাকে আবেগহীন করে তোলে। শৈশবের বন্ধু ভিকনির সঙ্গে মিলে এবং দুলানের পরামর্শে সে 'রুদালী'র পেশা গ্রহণ করে। অন্যের মৃত্যুতে কান্না করে, গড়াগড়ি দিয়ে, চুল ছিঁড়ে এভাবে অর্থ উপার্জন করে। শোষিত নারী উচ্চবর্ণের 'সম্মান' রক্ষার জন্য কাঁদে, কিন্তু নিজের দুঃখে কাঁদতে পারে না।

শেষে সানিচারী ও ভিকনি প্রতিরোধের পথ বেছে নেয়। তারা রুদালীদের একত্রিত করে 'ইউনিয়ন'-এর মতো সংগঠন গড়ার চিন্তা করে। কান্নাকে অস্ত্র বানিয়ে শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। সমালোচক আলোক রায় মন্তব্য করেছেন –

"শনিচরীর নেতৃত্বে রুদালীদের যে মিছিল, তা আদতে ক্ষুধার্ত মানুষের এক

শৈল্পিক ধর্মঘট। এখানে কান্নাটাই হাতিয়ার।"

আয়রনি ও প্রতীক কান্না যা সাধারণত দুর্বলতার প্রতীক তা হয়ে ওঠে শক্তি ও জীবিকার হাতিয়ার। উচ্চবর্ণের পুরুষদের আবেগহীনতার বিপরীতে নিম্নবর্গীয় নারীর 'কেনা কান্না' তাদের মুখোশ খুলে দেয়।

মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যে শোষিতের যন্ত্রণাকে তিনি শুধু বর্ণনা করেন না, তার মধ্যে থেকেই প্রতিরোধের বীজ বুনে দেন। 'রুদালী'তে আদিবাসী তথা দলিত নারীর জীবন যেন একটি 'অনাবৃত মহাদেশ'—যা শাসকশ্রেণির চোখে অদৃশ্য, কিন্তু লেখিকার কলমে জীবন্ত হয়ে ওঠে। মহাশ্বেতা দেবীর সামগ্রিক সাহিত্যে আদিবাসী প্রতিরোধের এই নান্দনিক রূপায়ন দেখা যায়; যেখানে বাস্তবতা হয় ইতিহাসের বিকল্প কণ্ঠস্বর, আর প্রতিরোধ হয় সাহিত্যিক অস্ত্র।'রুদালী' তার এক উজ্জ্বল উদাহরণ; কান্নার মধ্য দিয়ে যেখানে জেগে ওঠে প্রতিবাদের হাসি। এই রচনা পড়লে বোঝা যায়, মহাশ্বেতা দেবী শুধু লেখিকা নন তিনি শোষিতের সহযোদ্ধাও , যাঁর কলম প্রান্তিক মানুষের যন্ত্রণাকে শিল্পে পরিণত করে তাদেরই শক্তি ফিরিয়ে দেয়। -

"জমিদাররা শনিচরীর রক্ত জল করে খেয়েছে, এখন তার চোখের জলকেও

তারা কিনতে চায়।" (মহাশ্বেতা দেবী)

স্তনদায়িনী -

মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যে আদিবাসী জীবনের বাস্তবতা ও প্রতিরোধের নান্দনিক রূপায়ণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাঁর রচনায় প্রান্তিক, নিম্নবর্গীয় ও আদিবাসী সমাজের শোষণ-নিপীড়ন এবং তার বিরুদ্ধে নীরব বা স্পষ্ট প্রতিরোধের চিত্র ফুটে ওঠে

। এই প্রসঙ্গে 'স্তনদায়িনী' গল্পটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ; গল্পটি নারীর দেহকে পণ্যায়ন, মাতৃত্বের বাণিজ্যিকীকরণ এবং শ্রেণি-লিঙ্গভিত্তিক শোষণের মাধ্যমে প্রান্তিক জীবনের বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন।

গল্পের নায়িকা যশোদা একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ নারী। স্বামী কঙ্গালির দুর্ঘটনায় পা হারানোর পর সংসার চালাতে তিনি হালদার বাড়িতে স্তনদায়িনী হিসেবে কাজ নেন।হালদারবাড়ির বৌ রা সন্তানদের বুকের দুধ না দিয়ে শরীরের আকৃতি বজায় রাখতে চান, তাই যশোদার স্তনকে 'পণ্য' হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যশোদা অসংখ্য সন্তানকে দুধ খাওয়ান, কিন্তু শেষে স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে একা-নিঃসঙ্গ মৃত্যুবরণ করেন। সমালোচক পল্লব সেনগুপ্ত মন্তব্য করেছেন -

"যশোদার শরীরে যে পচন ধরেছে, তা আসলে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী

সমাজের পচন। যশোদার মৃত্যু কোনো আত্মসমর্পণ নয়, বরং সমাজের বিবেকের

প্রতি এক কুৎসিত চপেটাঘাত।"

আদিবাসী নারীদের মতো যশোদার দেহও শ্রেণিগত শোষণের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। আদিবাসী সমাজে জমি, অরণ্য ও শ্রমের শোষণ যেমন চলে, তেমনি এখানে নারীর মাতৃত্ব বাণিজ্যিক হয়ে যায়। মহাশ্বেতা দেবী দেখিয়েছেন, দারিদ্র্য ও শ্রেণিবৈষম্য কীভাবে মানুষের শরীরকে 'সম্পদ' বানিয়ে ফেলে। যশোদা ব্রাহ্মণ হলেও দারিদ্র্যের কারণে প্রান্তিক। আদিবাসী চরিত্রদের মতোই তাঁর জীবন অসহায়তা, নিঃসঙ্গতা ও সমাজের উপেক্ষায় ভরা। গল্পে ধনী পরিবারের নারীরাও নিজেদের দেহকে পুরুষতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ থেকে বাঁচাতে যশোদার দেহকে শোষণ করে—এটি নারী-নারী শোষণের চিত্র, যা মহাশ্বেতার সাহিত্যে বারবার ফিরে আসে।

প্রতিরোধের নান্দনিক রূপায়ণ -

মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যে প্রতিরোধ সবসময় সশস্ত্র বা চিৎকারময় নয়; তা প্রায়শই নীরব, শারীরিক বা অস্তিত্বগত।'স্তনদায়িনী'তে শরীরের মাধ্যমে প্রতিরোধ, যশোদার স্তন ক্যান্সার হয়ে মৃত্যু ঘটায়—এটি শোষণের বিরুদ্ধে শরীরের 'প্রতিবাদ'। দেহ যখন আর 'উপযোগী' থাকে না, তখন সমাজ তাকে ফেলে দেয়। এই মৃত্যু শোষণের পরিণতি হিসেবে উপস্থাপিত, যা পাঠককে ভাবায়। মাতৃত্বের মিথ ভাঙা যশোদা 'জগৎমাতা'-র মতো সকলকে দুধ খাওয়ান, কিন্তু নিজে মা হিসেবে উপেক্ষিত। এখানে মাতৃত্বের আদর্শকে বাস্তবতায় রূপান্তরিত করে মহাশ্বেতা দেবী প্রতিরোধ গড়েন। আদিবাসী সাহিত্যে 'দ্রৌপদী'তে নগ্নতা দিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যেমন শরীর প্রতিরোধের হাতিয়ার হয়, তেমনি এখানেও। গল্পে ধনী নারীরা আধুনিকতার নামে নিজেদের মুক্তি খোঁজেন, কিন্তু তা অপর নারীর শোষণের উপর দাঁড়িয়ে। এটি প্রতিরোধের নান্দনিকতা—পাঠককে দেখায় যে, সত্যিকারের মুক্তি ছাড়া শোষণ শুধু রূপ বদলায়।

মহাশ্বেতার অন্যান্য গল্প-উপন্যাসে ('দ্রৌপদী', 'অরণ্যের অধিকার', 'রুদালি', 'শিকার') আদিবাসী নারীরা সরাসরি প্রতিরোধ করেন—ধর্ষণের পর নগ্ন হয়ে দাঁড়ানো, অরণ্যের অধিকারের লড়াই ইত্যাদি। 'স্তনদায়িনী'তে এই প্রতিরোধ অন্তর্নিহিত ও বিপরীতমুখী—শোষণের চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে মৃত্যু দেখিয়ে তিনি সমাজকে প্রশ্ন করেন। এটি তাঁর নান্দনিক কৌশল: বাস্তবতাকে কঠোরভাবে উপস্থাপন করে পাঠকের চেতনায় প্রতিরোধ জাগানো।

'স্তনদায়িনী' যেখানে নারীর দেহকে কেন্দ্র করে শোষণ ও প্রতিরোধের চিত্র আঁকা হয়েছে। এটি আদিবাসী জীবনের সঙ্গে যুক্ত কারণ মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যে প্রান্তিক নারী একই শোষণের শিকার। তাঁর লেখা শুধু বর্ণনা নয়, প্রতিবাদ—যা পাঠককে অস্বস্তিতে ফেলে এবং চিন্তা করতে বাধ্য করে।মহাশ্বেতা দেবীর এই গল্প ও সামগ্রিক সৃষ্টি আজও প্রাসঙ্গিক, কারণ শ্রেণি, লিঙ্গ ও জাতিগত শোষণ এখনও চলছে। 'স্তনদায়িনী' পড়লে বোঝা যায়, মাতৃত্বের আদর্শ কতটা নিষ্ঠুর বাস্তবতায় পরিণত হয় এবং প্রতিরোধ কীভাবে শরীর ও অস্তিত্ব থেকেই উঠে আসে। এটি মহাশ্বেতার সাহিত্যের এক অমর উদাহরণ। যশোদার মৃত্যুশয্যায় যখন কেউ আসে না, মহাশ্বেতা দেবী লিখছেন—

"যশোদা প্রথম ও শেষবারের মতো বুঝল, যার কেউ নেই তার ঈশ্বরও নেই।" এই একটি লাইনই আদিবাসী ও প্রান্তিক মানুষের অসহায়ত্বের চূড়ান্ত বাস্তবতা ফুটিয়ে তোলে।

শিকার –

'শিকার' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মেরী ওরাও। সে এক ওঁরাও আদিবাসী নারী, যার বাবা অস্ট্রেলিয়ান তথা সায়েব এবং মা স্থানীয় ওঁরাও। ফলে তার গায়ের রং ফর্সা, দেখতে অন্যরকম—যা তাকে সমাজে দ্বিগুণ প্রান্তিক করে তোলে। আদিবাসী যুবকদের কাছে তার এই রং "প্রতিরোধের

দেওয়াল" হয়ে দাঁড়ায়। স্বাধীনতার পর সায়েবরা চলে গেলেও বন শোষণ চলতে থাকে—অবৈধ কাঠ কাটা, ঠিকাদার ও স্থানীয় শোষকদের দৌরাত্ম্য।

গল্পে ঐতিহ্যবাহী 'শিকার' উৎসবের প্রসঙ্গ আসে। আদিবাসীদের জীবনে একসময় বনে জন্তু-জানোয়ার ছিল, জীবন ছিল বন্য, শিকারের অর্থ ছিল জীবন-জীবিকার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু এখন "শিকারিরা" নিজেরাই জন্তুর চেয়ে নৃশংস। তারা বন কেটে শেষ করে আদিবাসীদের জীবন-জীবিকা ধ্বংস করছে। মেরী এই শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মেরীর মতো আদিবাসী নারী শুধু জাতিগতভাবে নয়, লিঙ্গগতভাবেও শোষিত। তার ফর্সা রং তাকে "অন্যরকম" করে তোলে, বিয়ে হয় না স্বজাতিতে। শোষক পুরুষ তার শরীরকে বস্তু হিসেবে দেখে।

প্রতিরোধের নান্দনিক রূপায়ণ -

'শিকার' গল্পের সবচেয়ে শক্তিশালী দিক হলো প্রতিরোধের নান্দনিক রূপায়ণ।মেরী শুধু প্রতিবাদ করে না, সে শোষককে যে তার শরীর ও বন দুটোই লুট করতে চায় তাকে হত্যা করে। এই হত্যা নিছক সহিংসতা নয়—এটি প্রতীকী শিকার। ঐতিহ্যবাহী শিকার উৎসবের দিনেই সে শোষককে "শিকার" করে। হত্যার পর সে নদীতে স্নান করে, নিজেকে "শুদ্ধ" করে এবং একা, নির্ভয়ে রেললাইন ধরে নতুন জীবনের দিকে এগিয়ে যায়।নারীর শরীর ও প্রকৃতি উভয়ই শোষিত, মেরী দুটোর বিরুদ্ধেই লড়ে। তার প্রতিরোধ ব্যক্তিগত নয়, সম্প্রদায়ের হয়ে। মহাশ্বেতা দেবী এখানে মিথ ও বাস্তবের মিশ্রণ ঘটান আদিবাসী শিকারের পুরাণকে আধুনিক শোষণের বিরুদ্ধে অস্ত্র বানান।

নান্দনিকভাবে গল্পটি সংক্ষিপ্ত, তীব্র এবং প্রতীকী। ভাষা সরল কিন্তু তীক্ষ্ণ—কোনো অতিরিক্ত আবেগ নয়, বরং ঠান্ডা, নির্মম বাস্তবতা যা পাঠককে নাড়া দেয়। মেরীর চরিত্রে প্রতিরোধের নারীশক্তি যেমন 'দ্রৌপদী' গল্পের দোপদী মেঝেনের মতো ফুটে ওঠে—নগ্নতা বা হত্যার মাধ্যমে নয়, বরং নিজের শরীর ও পরিবেশকে রক্ষা করে সে "অন্য" হয়ে ওঠে। গল্পটি দেখায় যে, প্রতিরোধ শুধু আন্দোলন নয়—এটি জীবনের, শরীরের ও সংস্কৃতির অংশ। মেরী শেষে "একা ও নির্ভয়" চলে যায়—যা এক ধরনের মুক্তির নান্দনিক চিত্র।

মহাশ্বেতা দেবীর এই রূপায়ণ শুধু সাহিত্য নয়, তা আদিবাসী অধিকার আন্দোলনেরও অংশ।'শিকার' গল্পটি পড়লে বোঝা যায়, বন ধ্বংস মানে শুধু পরিবেশ নয়—এটি একটি সম্পূর্ণ জীবনধারা ও প্রতিরোধের ধ্বংস। এই গল্প আজও প্রাসঙ্গিক, যখন আদিবাসী এলাকায় খনি, বন উজাড় ও উন্নয়নের নামে শোষণ চলছে।

এই গল্পগুলোতে মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসী নারীর জীবনকে কেন্দ্র করে প্রতিরোধের নান্দনিক রূপ তৈরি করেছেন। তিনি সংলাপে আদিবাসী ভাষা, লোককথা ব্যবহার করে বাস্তবতা তুলে ধরেন। প্রতিরোধ এখানে শারীরিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত বলেছেন –

"মহাশ্বেতা দেবীর কলম আদিবাসী জীবনের গভীরে প্রবেশ করে এমন এক আর্তনাদ

এবং হুঙ্কার তুলে আনে যা নাগরিক সাহিত্যের মেদ ঝরিয়ে দেয়।"

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, আপোষহীন সমাজকর্মী এবং প্রান্তিক মনুষের অকৃত্রিম বন্ধু মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্য কেবল সৃজনশীল গদ্য নয়, বরং তা শোষিত মানুষের এক প্রামাণ্য দলিল। 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে বিরসা মুণ্ডার ঐতিহাসিক বিদ্রোহকে তিনি যেভাবে সমকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন, তা আদিবাসী জনজাতির আত্মপরিচয় রক্ষার লড়াইকে এক অনন্য উচ্চতা দান করেছে। তিনি দেখিয়েছেন যে, জল-জঙ্গল-জমিনের ওপর আদিবাসীদের অধিকার কেবল জীবিকার প্রশ্ন নয়, বরং তা তাঁদের অস্তিত্ব ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পগুলিতেও এই প্রতিরোধের নান্দনিকতা এক রুক্ষ ও প্রতিবাদী রূপ পরিগ্রহ করেছে। তাঁর সাহিত্যে আদিবাসী জীবন কোনো রোমান্টিক কল্পনার বিষয় নয়; বরং রাষ্ট্রযন্ত্র, ভূমিদস্যু এবং বর্ণবাদী সমাজের বিরুদ্ধে এক নিরন্তর সংগ্রামের আখ্যান।

বস্তুত, মহাশ্বেতা দেবী তাঁর কলমকে শোষিতের হাতিয়ারে পরিণত করেছিলেন। অরণ্যের অধিকার থেকে শুরু করে তাঁর অসংখ্য ছোটগল্পে আদিবাসী জীবনের যে রূঢ় বাস্তবতা ও অদম্য প্রতিরোধের চিত্র ফুটে উঠেছে, তা বিশ্বসাহিত্যে তাঁকে এক অনন্য ও বিদ্রোহী সত্তা হিসেবে অমর করে রেখেছে। আদিবাসী জীবনের প্রান্তিক অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের মূল আঙিনায় নিয়ে আসাই তাঁর

শিল্পীজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা।" মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্য কেবল তথ্যের প্রতিবেদন নয়, বরং শোষিত মানুষের কান্নার এক মহাকাব্যিক রূপ।"

(ড. বারিদবরণ ঘোষ, মহাশ্বেতা দেবী: এক অনন্ত জিজ্ঞাসা)

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি -

- মহাশ্বেতা দেবী , অরন্যের অধিকার, করুনা প্রকাশনী , পৃষ্টা ১৭-১৮ ,
- মহাশ্বেতা দেবী , অরন্যের অধিকার, করুনা প্রকাশনী , পৃষ্টা ১৭ ,
- মহাশ্বেতা দেবী , অরন্যের অধিকার,করুনা প্রকাশনী , পৃষ্টা ২১৬ ,
- উজ্জ্বলকুমার মজুমদার -বাংলা উপন্যাসের অরণ্য ও আদিবাসী সমাজ । রত্নাবলী, কলকাতা , ১৪২ ,
- সমীক বন্দ্যোপাধ্যায়- মহাশ্বেতা দেবী: জীবন ও সাহিত্য , কলকাতা , ৮৯ ,
- সুমিতা চক্রবর্তী , বিশ শতকের বাংলা উপন্যাস , দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা , ২১৫,
- প্রমোদকুমার সেনগুপ্ত, নীল বিদ্রোহ থেকে তেভাগা , র‍্যাডিক্যাল ইমপ্রেশন ,১৭৪
- সুজিত মুখোপাধ্যায়,অগ্নিগর্ভ ,করুনা প্রকাশনী,১২২,
- পবিত্র সরকার, বাংলা কথাসাহিত্য: অন্য ভুবন, দে'জ পাবলিশিং ,পৃষ্ঠা-১৪২।
- পল্লব সেনগুপ্ত সম্পাদনা-মহাশ্বেতা দেবী:মানুষ ও সাহিত্য , রত্নাবলী , পৃষ্টা - ১১০ ।
- আলোকরঞ্জন দাসগুপ্ত , প্রবন্ধ সংগ্রহ , পৃষ্টা - ২২১ ।

Disclaimer/Publisher's Note: The views, findings, conclusions, and opinions expressed in articles published in this journal are exclusively those of the individual author(s) and contributor(s). The publisher and/or editorial team neither endorse nor necessarily share these viewpoints. The publisher and/or editors assume no responsibility or liability for any damage, harm, loss, or injury, whether personal or otherwise, that might occur from the use, interpretation, or reliance upon the information, methods, instructions, or products discussed in the journal's content.

****